ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব: তাঁর জীবনী ও দাওয়াহ

লেখক:

শাইখ আব্দুল ‘আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায

شركاء التنفيذ:

دار الإسلام جمعية الربوة رواد الترجمة المحتوى الإسلامي

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.

Tel: +966 50 244 7000
info@islamiccontent.org
Riyadh 13245- 2836
www.islamhouse.com

সকল প্রশংসা বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তাঁর বান্দা, রাসূল, তাঁর সৃষ্টিকূলের সর্বোৎকৃষ্ট মানব আমাদের নেতা ও ইমাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবীগণ ও যারা তাদেরকে ভালোবাসেন তাদের সবার ওপর রহমত, শান্তি ও বরকত নাযিল করুন।

তারপর: সম্মানিত ভাইয়েরা! সুপ্রিয় সন্তানেরা! এটি একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা, যা আমি তোমাদের সামনে চিন্তাভাবনাকে আলোকিতকরণ, বাস্তবতাকে স্পষ্টকরণ এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের নসীহত স্বরূপ আর আমার উপরে বর্তিত তাঁর ব্যাপারে আলোচনা সংক্রান্ত দ্বায়িত্ব আদায় করার উদ্দেশ্যে পেশ করছি। আর এই আলোচনার শিরোণাম হচ্ছে: ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব এবং তার জীবনী ও দাওয়াহ।

যখন সংস্কারকবৃন্দ, দা'ঈগণ ও মুজাদ্দিদদের সম্পর্কে আলোচনা হয়, তাদের অবস্থা, উত্তম বৈশিষ্ট্য, মহৎ কর্মসমূহের আলোচনা হয় এবং তাদের জীবন চরিত বিশ্লেষণ করা হয়, যা তাদের ইখলাছের প্রতি আর তাদের দাওয়াহ এবং সংস্কারের সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে। (আবার) যখন এ সমস্ত উল্লিখিত সংস্কারকদের আখলাক, কর্ম ও জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তখন তাতে অন্তরসমূহ আগ্রহী হয় আর হৃদয়গুলো প্রশান্তি বোধ করে এবং দীনের প্রতি প্রত্যেক আগ্রহী এবং সংস্কার ও সত্যের পথে আহবান করতে উৎসাহী ব্যক্তি তা শুনতে পছন্দ করে। তখনই আমি তোমাদের কাছে এক সম্মানিত ব্যক্তি, মহান সংস্কারক ও আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন দা'ঈ সম্পর্কে বর্ণনা করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন: শাইখ,

জাজিরাতুল আরবে হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর ইসালামের মুজাদ্দিদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব ইবন সুলাইমান ইবন আলী আত-তামীমী আল-হাম্বালী।

মানুষ এই ইমামকে জানতে পেরেছে বিশেষত: তাদের আলিমগণ, নেতৃবর্গ, ও গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ, জাজিরাতুল আরব ও এর বাইরে। মানুষেরা তার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত অসংখ্য লেখা-লেখিও করেছে। অনেক মানুষই তার ব্যাপারে একক বই রচনা করেছে, এমনকি প্রাচ্যবিদরাও তার ব্যাপারে অসংখ্য লেখালেখি করেছে। আবার অন্যরাও নিজেদের সংস্কারকদের নিয়ে লেখা ও নিজেদের ইতিহাস নিয়ে লেখা বইসমূহে তার কথা উল্লেখ করেছে । তাদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান, তারা তাকে বড় পর্যায়ের সংস্কারক, ইসলামের মুজাদ্দিদ, তিনি তার রবের পক্ষ হতে আসা হিদায়াত ও নূরের উপরেই ছিলেন বলে অভিহিত করেছেন। যদিও তাদের গণনা করা অনেক কঠিন।

এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: বিশিষ্ট লেখক শাইখ আবূ বাকর হুসাইন ইবনু গাননাম আল-ইহসায়ী। তিনি এই শাইখ সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ও উপকারী লেখনী উপহার দিয়েছেন। তিনি তার জীবনী ও তার সংগ্রাম সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তার গ্রন্থাবলী সম্পর্কে এবং মহান আল্লাহর কিতাব হতে তার বিভিন্ন উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ সম্পর্কেও অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের (নিষ্ঠাবান লেখকদের) মধ্যে আরো রয়েছেন: শাইখ উসমান ইবনু বিশর, যিনি তার “উনওয়ানুল মাজদ’ (মর্যাদার ঠিকানা) নামক কিতাবে শাইখ (মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব),

তার দাওয়াহ, জীবনী, জীবনের ইতিহাস ও যুদ্ধ-সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর তাদের মধ্যে জাজিরাতুল আরবের বাইরে রয়েছেন: ড. আহমাদ আমীন, তিনি তার 'যুআমাউল ইসলাহ' বা 'সংস্কারের নেতৃবৃন্দ' গ্রন্থে তার ব্যাপারে লিখেছেন এবং ইনসাফ করেছেন। তাদের মধ্যে আরো রয়েছেন সম্মানিত শাইখ মাস'ঊদ নদভী, তিনি তার সম্পর্কে লিখেছেন এবং তাকে 'মজলুম সংস্কারক' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি তার জীবনী সম্পর্কে উত্তম আলোচনা করেছেন। তার সম্পর্কে আরো অনেকেই লিখেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন: সম্মানিত শাইখ আমীর মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আস-সান'আনী, তিনি তার সমসাময়িক ছিলেন এবং তার দাওয়াহর উপরেই ছিলেন। যখন তার কাছে শাইখের দাওয়াহ পৌঁছল, তখন তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিলেন।

অনুরূপভাবে তার সম্পর্কে আরো আলোচনা করেছেন সম্মানিত আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, যিনি 'নাইলুল আওতার' নামক গ্রন্থের লেখক এবং তিনি তার ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এরা ছাড়াও আরও অনেকেই তার সম্পর্কে লিখেছেন যা পাঠকবৃন্দ ও আলেম সমাজ জ্ঞাত। অধিকাংশ মানুষের কাছে এই ব্যক্তির (শাইখের) অবস্থা, জীবন বৃত্তান্ত ও দাওয়াত সম্পর্কে অস্পষ্ট থাকার কারণে আমি চিন্তা করেছি তার অবস্থা, তার উত্তম জীবন-চরিত, উৎকৃষ্ট দাওয়াত এবং সত্য জিহাদ সম্পর্কে বর্ণনা করার ব্যাপারে ভূমিকা রাখব। আর আমি এই ইমাম সম্পর্কে যা জানি, তা স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করব যেন এই ব্যক্তির অবস্থায় এবং তার দাওয়াতে এবং

তিনি যার ওপর ছিলেন তার ব্যাপারে যার ভেতর সামান্য অস্পষ্টতা রয়েছে অথবা সন্দেহ রয়েছে সে যেন তার ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান হাসিল করতে পারেন। এই ইমাম জন্মগ্রহণ করেন ১১১৫ হিজরী সালে, আর এটাই তার জন্মের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কথা এবং বলা হয়ে থাকে: তার জন্ম হয়েছিল ১১১১ হিজরীতে। কিন্তু প্রসিদ্ধ কথা হলো প্রথমটি, সেটি হচ্ছে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন: ১১১৫ হিজরী সালে, সর্বোত্তম রহমত ও পরিপূর্ণ অভিবাদন এর অধিকারীর (হিজরতের অধিকারী তথা রসূল সা. এর) উপরে।

এবং তিনি তাঁর পিতার কাছে আল-‘উআইনাহ নামক শহরে শিক্ষা লাভ করেন, এই শহরটিই তার জন্মস্থান ছিল। এটি হচ্ছে ইয়ামামার অন্তর্গত নজদ এর একটি সুপরিচিত গ্রাম। যা রিয়াদ থেকে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, রিয়াদ এবং এই শহরের মধ্যে ৭০ কিলোমিটার দূরত্ব। সেখানেই তিনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উত্তমভাবে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। ছোট বয়সেই তিনি তার পিতা আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু সুলাইমানের কাছে কুরআন হিফজ করেন এবং পড়াশোনা ও ফিকহের জ্ঞান অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করেন, যিনি ছিলেন অনেক বড় একজন ফকীহ এবং যোগ্য আলেম এবং তিনি আল-উআইনাহ শহরের কাযী (বিচারপতি) ছিলেন। তিনি (শাইখ মুহাম্মাদ) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর হজ করেন ও আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহতে গমন করেন এবং হারাম শরীফের আলেমদের নিকট থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন। এরপর তিনি মদীনার দিকে মনোনিবেশ করেন (মদিনার অধিবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বোত্তম রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক), তিনি সেখানে আলেমদের নিকট একত্রিত হন ও

সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং তৎকালীন সময়ে মদিনায় থাকা প্রসিদ্ধ বড় দুইজন আলেমের নিকট হতে তিনি ইলম অর্জন করেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন ইব্রাহিম ইবন সাইফ আন্ নজদী, তিনি মাজমা'আহ শহরের বংশোদ্ভুত। তিনি ছিলেন শাইখ ইব্রাহিম ইবন আব্দুল্লাহ এর পিতা যিনি 'আল-আজবুল ফা-ইদ ফী ইলমিল ফারাইদ্ব' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি শাইখ মুহাম্মাদ হায়াত আস-সিন্দী থেকেও মদিনাতে ইলম অর্জন করেন । এই দুইজন আলিম মদিনাতে তিনি যাদের কাছ থেকে ইলেম অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ, হয়তো তিনি এই দুজন ছাড়াও আরো অনেকের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছিলেন যাদেরকে আমরা চিনি না।

জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা হন। অতঃপর তিনি বসরায় যান এবং সেখানে আলেমদের সাথে একত্রিত হন এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন সেই পরিমাণ তাদের থেকে ইলম গ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি আল্লাহর তাওহীদের দিকে দাওয়াত পেশ করেন, মানুষকে সুন্নাহর দিকে আহবান করেন এবং মানুষের কাছে এটা পেশ করেন যে, সমস্ত মুসলিমের উপর ওয়াজিব যে, তারা তাদের দীনকে গ্রহণ করবে আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকে, তিনি এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এবং সেখানের উলামাদের সাথে এ ব্যাপারে মুনাজারা করেন। সেখানে তাঁর মাশায়েখদের মধ্য হতে অন্যতম একজন ব্যক্তি ছিলেন, যার নাম ছিল শাইখ মুহাম্মদ আল-মাজমূয়ী, তখন বসরার কতিপয় ভ্রষ্ট আলিম তার উপরে চড়াও হয়, আর তখন তার উপরে এবং তার উক্ত শায়খের উপরে বেশ

কিছু কষ্ট/অত্যাচার নেমে আসে, আর এ কারণেই তিনি সেখান থেকে বের হয়ে যান এবং তার নিয়তের মধ্যে ছিল যে: তিনি সিরিয়াতে যাবেন; কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ পাথেয় না থাকার কারণে তিনি সেখানে যেতে সক্ষম হননি। তাই তিনি বসরা হতে জুবায়ের নামক স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং পরবর্তীতে জুবায়ের থেকে তিনি ইহসা-র দিকে মনোনিবেশ করেন এবং সেখানে আলেমদের সাথে একত্রিত হন এবং তাদের সাথে দীনের অনেক মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর তিনি হুরাইমিলা নামক শহরের দিকে গমন করেন, এবং -আল্লাহই ভাল জানেন- এটা ছিল হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের মধ্যবর্তী সময়ে, কেননা তার পিতা আল-উয়ায়ইনা শহরের কাজী ছিলেন। সেখানে তার মধ্যে এবং সেখানকার আমীরের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তখন তিনি সেখান থেকে হুরাইমিলাতে গমন করেন ১১৩৯ হিজরী সালে। শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাবের পিতা ১১৩৯ হিজরীতে হুরাইমিলাতে গমন করার পরে তিনি তার পিতার কাছে গমন করেন। সুতরাং তার (শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাবের) হুরাইমিলা শহরে আগমন ঘটে ১১৪০ হিজরী সালে অথবা এর পরবর্তী সময়ে। তিনি সেখানে বসবাস করতে থাকেন এবং তিনি সেখানে ইলম, তা'লীম ও দাওয়াতের কাজে মশগুল হয়ে পড়েন, যতদিন না ১১৫৩ হিজরী সালে তার পিতা মারা যান। এরপর হুরাইমিলা শহরের কিছু লোকের কাছ থেকে তিনি কষ্টের সম্মুখীন হন, কিছু নির্বোধ লোকেরা তাকে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করে। বলা হয়ে থাকে: কতিপয় লোক তার উপরে চড়াও হয়। তাদের ব্যাপারে অন্যান্য মানুষ জেনে গেলে তারা সেখান হতে পালিয়ে যায়। এ

ঘটনার পর শাইখ রহিমাহুল্লাহ আল-উয়ায়ইনা শহরের দিকে পুনরায় গমন করেন।

এসকল নির্বোধ লোকদের তার উপরে রাগান্বিত হওয়ার অনেকগুলো কারণ ছিল, যার মধ্যে রয়েছে: তিনি সৎ কাজের আদেশ করতেন এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতেন। তিনি আমীরদেরকে এমন অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন যারা মানুষের জানমাল নষ্ট করে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করে। এ সব নির্বোধেরা হচ্ছে - যাদেরকে সেখানে “আবীদ” বা দাস বলা হত। যখন তারা জানতে পারল যে, শাইখ তাদের বিরোধী এবং তিনি তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সন্তুষ্ট নন এবং তিনি আমীরদেরকে তাদের শাস্তি এবং তাদের মন্দ কাজের জন্যে দন্ড প্রদানের জন্য উৎসাহ দেন, তখন এ সমস্ত লোকেরা তাকে গোপনে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ তা‘আলা তাকে রক্ষা করেন এবং নিরাপত্তা দেন। এরপর তিনি আল-উয়ায়না শহরের আমীরের কাছে গমন করেন, তখন সেখানে উসমান ইবন নাসির ইবন মা‘মার নামক প্রশাসক ছিলেন। তিনি তার কাছে অবতরণ করেন এবং আমীর তাকে স্বাগত জানান। আমীর তাকে বললেন: আপনি আল্লাহর পথে দাওয়াত দিন, আমরা আপনার সাথে আছি এবং আপনার সহযোগী। তিনি তার ব্যাপারে উত্তম আচরণ ও ভালোবাসা প্রকাশ করেন এবং তার কার্যক্রমের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

অতঃপর শাইখ সেখানে দীনি ইলম শিক্ষা, পথপ্রদর্শন, আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, মানুষকে কল্যাণমূখী করতে এবং নারী-পুরুষ সবাইকে আল্লাহর জন্যই মহব্বত করার

কাজে মশগুল হন। আর তার এই কর্মকাণ্ড আল-উয়ায়নাহ শহরে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের গ্রামসমূহ হতে তার কাছে মানুষ আসতে শুরু করে। একদিন শাইখ (মুহাম্মাদ) আমীর উসমানকে বললেন: আমাদেরকে যাইদ ইবনুল খাত্ত্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর (কবরের উপরে নির্মিত) গম্বুজটি ধ্বংস করার অনুমতি দিন; কেননা তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হেদায়েত বহির্ভূত পন্থায়, আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই কর্মের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর স্থাপনা নির্মাণে নিষেধ করেছেন এবং কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতেও নিষেধ করেছেন। আর এই গম্বুজ মানুষকে ফিতনাতে নিপতিত করেছে এবং আকিদাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। আর এর মাধ্যমে শিরক হচ্ছে। সুতরাং তা ধ্বংস করা আবশ্যক। তখন আমীর তাকে বললেন: এ ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। তখন শাইখ বললেন: আমি আশঙ্কা করছি জুবাইলার অধিবাসীরা বিদ্রোহ করতে পারে। জুবাইলা হচ্ছে উক্ত কবরের কাছাকাছি একটি গ্রাম। তখন উসমান তার সাথে ৬০০ সশস্ত্র যোদ্ধা সহকারে গম্বুজটি ধ্বংস করতে বের হলেন এবং তাদের সাথে শাইখ রহমাতুল্লাহি আলাইহিও ছিলেন। যখন তারা গম্বুজটির কাছাকাছি উপনীত হলেন, তখন জুবাইলার অধিবাসীরা এ ব্যাপারে শুনামাত্র বের হয়ে আসলো, যেন তারা এটিকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে এবং গম্বুজটিকে সংরক্ষণ করতে পারে। কিন্তু তারা যখন আমীর উসমানকে এবং তার সাথে যারা রয়েছে তাদেরকে দেখল, তখন তারা তা থেকে বিরত থাকলো এবং সেখান থেকে ফিরে গেল। এরপর শাইখ সেটাকে সরাসরি

ধ্বংস করেন এবং সেখান থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার হাত দিয়ে উক্ত কবরটিকে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ তার উপর রহমত করুন। আমরা শাইখের উত্থানের আগে নজদের অবস্থা সম্পর্কে এবং শাইখের উত্থান ও দাওয়াতের ব্যাপারে এখন কিছু বিষয় উল্লেখ করব।

শাইখের দাওয়াতের পূর্বে নজদের অধিবাসীদের অবস্থা এমন ছিল যে, এ ব্যাপারে একজন মুমিন কখনো খুশি হতে পারে না। সেখান থেকে শিরকের উৎপত্তি ঘটেছিল এবং তা ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি গম্বুজসমূহের ইবাদত করা হত, গাছপালা ও প্রস্তরখন্ডের ইবাদত করা হত। আরো সেসব ব্যক্তিবর্গের ইবাদাত করা হতো যারা দাবি করত বেলায়েতের। অথচ তারা নির্বোধ বা পাগল ছিলো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অসংখ্য বেলায়েতের দাবীদার এমন সব মানুষের ইবাদাত করা হতো, যাদের বিবেক-বুদ্ধি ছিলো না, তাদের ছিলো বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদনা। নজদে যাদুকর ও গণক ছিলো। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা এবং সেগুলোকে অন্তরে বিশ্বাস করা প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। এগুলোকে নিষেধকারী কেউ ছিল না, শুধু আল্লাহ যাদের চান তারা ব্যতীত। প্রবৃত্তি ও দুনিয়ার প্রতি ঝাপিয়ে পড়ার আগ্রহ মানুষের উপরে প্রবল হয়ে উঠেছিল। আর আল্লাহর জন্যে দণ্ডায়মান ও তাঁর দীনকে সাহায্যকারীর সংখ্যা কমে গিয়েছিল। এরূপ অবস্থা হারামাইন-শরীফাইনেও ছিল। ইয়ামানেও এই শিরক, কবরের উপরে গম্বুজ তৈরী, আউলিয়াদেরকে আহ্বান করা ও তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়েছিল। ইয়ামানে এসব অনেক বেশী পরিমাণে

ছিল। আর নজদে এসব অগণিত মাত্রাই ছিল। কবর, গুহা, বৃক্ষ-পল্লব, পাগল ও মস্তিষ্ক বিকৃতের মাঝে ঘুরপাক খেত আর গাইরুল্লাহকেই আহ্বান করা হত। তাদের কাছে আল্লাহর পাশাপাশি (গায়েবী) সহযোগিতা কামনা করা হত। অনুরূপভাবে নজদে আরো প্রসিদ্ধি পেয়েছিল জিনদেরকে আহ্বান করা এবং তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া। জীনদের কাছে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় এবং তাদের অকল্যাণের ভয়ে তাদের উদ্দেশ্যে পশু-প্রাণী যবেহ করা হতো এবং সেগুলোকে গৃহসমূহের কোণে রেখে দেয়া হতো। সুতরাং যখন সম্মানিত ইমাম ও শাইখ এই শিরক এবং মানুষের মধ্যে তা প্রকাশ পাওয়া দেখতে পেলেন এবং তিনি দেখলেন যে, সেখানে এ সব কাজে বাধাদানকারী কেউ নেই, আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের জন্য কেউ দন্ডায়মান নেই- তখন তিনি সমস্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন এবং দাওয়াতের উপর সবর করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, জিহাদ সবর এবং কষ্ট সহ্য করা ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। সুতরাং তিনি আল-উয়ায়নাহ শহরে থাকাকালীন সময়ে তা‘লিম, দাওয়াত ও মানুষকে আল্লাহমুখী করার ব্যাপারে প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলেন। তিনি এ ব্যাপারে আলেমদের কাছে লেখালেখী ও তাদের সাথে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আরো প্রচেষ্টা অবহত রাখেন। তার আশা ছিলো তারা আল্লাহর দীনকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তার সাথে দাঁড়াবে এবং এই শিরক ও কুসংস্কার দূর করতে তারা সংগ্রামে লিপ্ত হবে। সুতরাং তার দাওয়াতে নজদ শহরের একদল আলিম এবং এ শহরের বাইরের কতিপয় আলিম যেমন: হারামাইনের আলিমগণ, ইয়ামানের আলিমগণ এবং আরো অন্যান্য অনেকেই তার কাছে সমর্থন পূর্বক

চিঠি লিখলেন। তবে একদল আলেম তার বিরোধিতা করল এবং তিনি যার দিকে আহ্বান করেছেন সেটাকে নিন্দা করতে লাগল। তারা তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। আর এই সমস্ত লোকেরা দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল: এক শ্রেণি হচ্ছে তারা অজ্ঞ-মূর্খ ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী, যারা আল্লাহর দীন সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং আল্লাহর তাওহীদ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই রাখে না; বরং তারা শুধু সেটাই জানে যা মূর্খতা, ভ্রষ্টতা, শিরক, বিদআত এবং কুসংস্কারের ইত্যাদির উপরে তারা তাদের পূর্বপুরুষ, পিতা ও দাদাদেরকে পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত লোক সম্পর্কে বলেছেন: "[বরং তারা বলে:] 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি আর নিশ্চয় আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে হেদায়াতপ্রাপ্ত হব।" [আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৩] অন্য আরেকটি শ্রেণি এমন ছিল, যারা ইলমের দিকে সম্পৃক্ত ছিল, তারা শাইখের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল নিছক তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে। যেন জনসাধারণ এ কথা না বলতে পারে যে, তোমাদের কি হল যে তোমরা আমাদেরকে এ বিষয়ে কোনো বাঁধাদান করোনি? কেনই বা ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব আগমন করল? আর সে হকের উপরে থাকল; অথচ তোমরা আলিমরা এই ভ্রান্ত জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করোনি? সুতরাং তারা হিংসা করতে শুরু করল, সাধারণ জনগণের কাছে লজ্জা পেল। ইহুদীরা যেভাবে আখিরাতের উপরে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছিল, ঠিক তাদের অনুকরণে তারাও দুনিয়াকে আখিরাতের উপরে প্রাধান্য দিয়ে হকের সাথে বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটাল। আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

শাইখ ধৈর্য ধারণ করলেন এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। জাজিরাতুল আরবের ভিতরের এবং বাইরের যেসব আলিম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে হতে তাকে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন, তারা তাকে উৎসাহ দিতে থাকলেন। ফলে তিনি এ কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন এবং স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আর ইতোপূর্বেই তিনি আল্লাহর কিতাবে নিজেকে নিবদ্ধ করেছিলেন, আল্লাহর কিতাবের তাফসীর ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এছাড়াও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনীর উপরেও নিজেকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। তিনি সেখানেও প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছিলেন এবং দূরদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। এমনকি তিনি সেখান থেকে এমন কিছু পেয়েছিলেন, যা তাকে সাহায্য করেছিলো এবং হকের উপরে স্থায়ীত্ব এনে দিয়েছিলো। সুতরাং তখন তিনি যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করলেন। দাওয়াত ও মানুষের মাঝে তা প্রসারে মনোনিবেশ করলেন। আমীর ও আলিমদের কাছে এ ব্যাপারে লিখিত চিঠি প্রেরণ করেন যাতে এ ব্যাপারে যা হওয়ার তাই হয়।

আল্লাহ তা`আলা তার সকল উত্তম আশাগুলোর বাস্তবায়ন করলেন এবং তার দ্বারা দাওয়াতের কার্যক্রম প্রসার ঘটালেন। তার মাধ্যমে হককে সাহায্য করলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সহযোগী, সাহায্যকারী ও সঙ্গী-সাথী প্রস্তুত করে দিলেন। অবশেষে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা হল এবং আল্লাহর কালিমা সমুন্নত হল। ফলে শাইখ আল-উয়ায়নাহ শহরে শিক্ষাদান ও পথ-প্রদর্শনের

মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখলেন। অতঃপর তিনি তার সর্বোচ্চ শ্রম দিয়ে কাজ শুরু করলেন এবং শিরকের প্রভাব দূর করার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিলেন। যখনই তিনি দেখলেন [মৌখিক] দাওয়াত ফলপ্রসূ হচ্ছে না, তখন তিনি প্রায়োগিকভাবে তার পক্ষে শিরকের প্রভাব বা চিহ্ন যতটুকু দূর করা সহজ ও সম্ভব হয় সে ব্যাপারে সরাসরি কার্যক্রম শুরু করলেন। আমীর উসমান ইবনু মা'মারকে তিনি বললেন: যাইদ (ইবন উমার) ও যাইদ ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কবরের উপরে নির্মিত গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলার কোনো বিকল্প নেই। আর যাইদ ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ভাই। আল্লাহ তাদের সকলের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি ছিলেন মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের একজন, যা ১২ নববী হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। তাদের উল্লেখ করা তথ্য মতে তার কবরের উপরে একটি গম্বুজ স্থাপন করা হয়। হতে পারে, সেটি অন্য কারো কবর; কিন্তু তারা দাবী করে থাকে যে, সেটি যাইদ ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কবর। সুতরাং আমীর উসমান তার সাথে একমত পোষণ করলেন যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এরপরে আল্লাহদুলিল্লাহ উক্ত গম্বুজটি ধ্বংস করা হলো। আজ পর্যন্ত তার চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করা হলো, সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই। আল্লাহ তা'আলাই সেটিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন; যেহেতু সেটি ভালো নিয়তে, সৎ পথে এবং হককে সাহায্যের নিমিত্তেই ধ্বংস করা হয়েছিল। সেখানে আরো অন্যান্য অনেক কবর ছিল, যার মধ্যে একটি কবর ছিল, যাকে বলা হত: সেটি হচ্ছে দ্বিরার ইবনুল

আঝওয়ার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নামক সাহাবীর কবর। সেটার উপরেও একটি গম্বুজ ছিল। সেটাও ধ্বংস করা হয়। সেখানে আরো অনেক স্থাপনা ছিল যেগুলোকে মহান আল্লাহ দূর করে দিয়েছেন। সেখানে আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গাছসমূহের ইবাদাত করা হতো। সেগুলোও বিলুপ্ত করা হলো এবং মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হলো।

এখানে এসব উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাইখ রাহিমাহুল্লাহ কথা ও কাজের মাধ্যমে দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনবরত ছিলেন। যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শাইখের কাছে একদিন একজন মহিলা আগমণ করল। সে তার কাছে এসে একাধিকবার ব্যভিচার করার স্বীকৃতি দিল। তখন তিনি তার বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তাকে বলা হল: সে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন, কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং যখন সে দৃঢ়তার সাথে স্বীকৃতি দিল এবং তার স্বীকৃতি থেকে সে আর প্রত্যাবর্তন করল না, সেই সাথে তাকে কোন জবরদস্তিও করা হয়নি। ফলে তাতে কোন সন্দেহও থাকল না। মহিলাটি বিবাহিত ছিল। তখন শাইখ রহমতুল্লাহি আলাইহি আদেশ করলেন তাকে রজম করার জন্য। তাই তাকে শায়েখের আদেশে রজম করা হল। এটি আল-উয়ায়নাহ শহরে তিনি কাজী থাকা অবস্থার ঘটনা। সুতরাং ফলে গম্বুজ ধ্বংস করা, মহিলাটিকে রজম দেওয়া, মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত এবং বিভিন্ন জায়গা হতে আল-উয়ায়নাহ শহরে হিজরতকারীদের হিজরত করার মাধ্যমে তার কার্যক্রম প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এদিকে আহসা শহর ও তার আশ-পাশের এলাকার আমীর বনু খালিদ সুলাইমান ইবন উরাই'য়ির আল-খালিদীর নিকট শাইখের কর্মকাণ্ডের কথা পৌঁছালো যে, তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, গম্বুজসমূহ ধ্বংস করে ফেলেন, হুদূদ কায়েম করেন, কাজেই এই মরুবাসী বেদুইন শাইখের কর্মকাণ্ডকে অত্যন্ত কঠিন ভাবে দেখল। যেহেতু বেদুইনদের অভ্যাস হচ্ছে - যাকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন তিনি বাদে - জুলুম করা, রক্তপ্রবাহ করা, ধন-সম্পদ লুন্ঠন করা এবং পবিত্রতা লঙ্ঘন করা ইত্যাদি। সুতরাং উক্ত আমীর আশঙ্কা করলো যে, এই শাইখের বিষয়টি বড় আকার ধারন করবে এবং বেদুইন আমীরের ক্ষমতাকে নস্যাৎ করবে। সুতরাং সে উসমানের কাছে ভীতি প্রদর্শন করে চিঠি লিখল আর তাকে আদেশ দিল: আল-উয়ায়নাহ শহরে তার কাছে থাকা এই অনুসৃত ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে। আর সে এটাও বলল: নিশ্চয়ই এই অনুসৃত ব্যক্তি যে, তোমাদের কাছে রয়েছে, আমাদের কাছে তার ব্যাপারে এই এই সংবাদ পৌঁছেছে। হয়ত তুমি তাকে হত্যা করবে অথবা আমরা তোমাকে যে ট্যাক্স প্রদান করি তা প্রদান করা বন্ধ করে দিবো। তার কাছে আমীর উসমানের স্বর্ণের ট্যাক্স ছিল। ফলে উসমানের উপর এই আমীরের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেল এবং সে ভয় করল যদি সে তার অবাধ্য হয়, তবে সে তার ট্যাক্স বন্ধ করে দিবে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তখন তিনি শাইখকে বললেন: এ আমীর আমাদের কাছে এই এই মর্মে চিঠি লিখেছে। আর আমাদের পক্ষ হতে আপনাকে হত্যা করা সম্ভব হবে না, আবার আমরা এই আমীরকে ভয়ও করি এবং আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও সক্ষম নই। যদি আপনি চান আমাদের

কাছ থেকে অন্যত্র চলে যাবেন, তবে আপনি তা করতে পারেন। তখন শাইখ বললেন: নিশ্চয়ই আমি যে দিকে আহ্বান জানাই তা হচ্ছে: আল্লাহর দীন, এবং কালিমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” তথা আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই- এ কথার বাস্তবায়ন ও মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্যের বাস্তবায়ন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দীনকে আঁকড়ে ধরবে, তাকে সাহায্য করবে এবং এ ব্যাপারে সত্যের পরিচয় দিবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন, তাকে শক্তিশালী করবেন এবং তার শত্রুদের শহরগুলোর উপরে তাকে কর্তৃত্ব প্রদান করবেন। তাই যদি আপনি সবর করেন, সুদৃঢ় থাকেন এবং এই কল্যাণকে গ্রহণ করতে চান, তাহলে সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাকে অচিরেই সাহায্য করবেন। তিনি এই মরুবাসী বেদুইন ও অন্যান্যদের থেকে আপনাকে হেফাযত করবেন। অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা তার শহর ও তার বাসিন্দাদের উপরে আপনাকে কর্তৃত্ব প্রদান করবেন। তখন তিনি বললেন: হে শাইখ! নিশ্চয় আমরা তার সাথে যুদ্ধে পারব না এবং তার বিরোধিতায় আমরা সবরও করতে পারব না। তখন শাইখ আল-উয়ায়নাহ থেকে বের হয়ে আদ-দিরইয়্যাহ শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি সেখানে হেঁটে হেঁটে উপস্থিত হন, যেরকমটি তারা উল্লেখ করেছেন। তিনি সেখানে দিনের শেষভাগে পৌঁছান। আর আল-উয়ায়নাহ হতে তিনি দিনের প্রথমভাগে পায়ে হেঁটে রওনা দেন। আমীর উসমান তাকে কোন বাহনও প্রদান করেনি। শাইখ এখানে এসে শহরের উঁচু একটি স্থানে একজন সম্মানিত ব্যক্তির কাছে আগমন করেন। তার নাম বলা হয়: মুহাম্মাদ ইবনু সুওয়াইলিম আল-উরাইনী। তিনি তার কাছে এসে অবতরণ

করেন। বলা হয়ে থাকে: এই ব্যক্তি তার কাছে শাইখের আগমণ নিয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং তার যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। সে ভয় পাচ্ছিল দিরইয়্যাহ শহরের আমীর মুহাম্মাদ বিন সা'ঊদ হতে। তখন শাইখ তাকে আশ্বস্ত করে বললেন: আপনি কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আর আমি যেদিকে মানুষকে আহ্বান করছি সেটি হচ্ছে আল্লাহর দীন। আর অচিরেই আল্লাহ এটিকে বিজয়ী দান করবেন। এদিকে মুহাম্মাদ ইবন সা'ঊদের কাছে শাইখ মুহাম্মাদের খবর পৌঁছে গেল। বলা হয় যে, তাকে তার স্ত্রীই এ সংবাদ দিয়েছিলেন। তার কাছে কতিপয় সৎকর্মশীল ব্যক্তি আগমণ করে তাকে বলেছিলেন: আপনি আমীর মুহাম্মদ ইবন সা'ঊদকে এই ব্যক্তি (শায়েখ) সম্পর্কে সংবাদ দিন। আর তাকে এই ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করার জন্য উৎসাহ প্রদান করুন। আর তাকে তার সহযোগিতা ও সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দিন। আর আমীর মুহাম্মাদের স্ত্রী একজন নেককার ও মহীয়সী নারী ছিলেন। তাই যখনই তার কাছে (স্বামী) দিরইয়্যাহর আমীর মুহাম্মাদ ইবন সা'ঊদ আসলেন, তখনই তিনি তাকে বললেন: এই মহান গণীমতের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এটা একটি গনিমত যা আল্লাহ আপনার কাছে টেনে নিয়ে এসেছেন। একজন দা'ঈ ব্যক্তি যে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান করেন, আল্লাহর কিতাবের দিকে আহবান করেন, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর দিকে আহবান করেন। কতই না মহান সে গনিমত! আপনি অতি দ্রুত তা গ্রহণ করুন, অতি দ্রুত তার সাহায্যে এগিয়ে আসুন এবং কখনোই পিছনে ফিরে তাকাবেন না। ফলে আমির তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং

এরপর তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন যে, তিনি নিজেই তার কাছে যাবেন নাকি তাকে তার কাছে দাওয়াত দিবেন?! অতঃপর তাকে পরামর্শ দেওয়া হলো, বলা হয়ে থাকে যে, একদল সৎকর্মশীলদের সাথে তার স্ত্রীই তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যারা তাকে বলেছিলেন: এটা সমীচীন নয় যে, আপনি তাকে আহ্বান করবেন। বরং এটা উচিত যে, আপনি তার বসবাসের স্থানে নিজেই যাবেন। আর আপনি ইলম এবং কল্যাণের পথে আহ্বানকারীকে সম্মান করবেন। তখন তিনি এ কথায় সাড়া দিলেন। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য সৌভাগ্য ও কল্যাণ লিখে রেখেছিলেন এবং তার গন্তব্যকে সম্মানিত করেছিলেন। সুতরাং তিনি মুহাম্মাদ ইবন সুওয়াইলিমের বাড়িতে অবস্থানরত শাইখের কাছে যান। তিনি তার কাছে উপস্থিত হন, তাকে সালাম দেন এবং তার সাথে আলোচনা করেন। তাকে বললেন: শাইখ মুহাম্মাদ আপনি সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, নিরাপত্তার সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সুসংবাদ গ্রহণ করুন। তখন শাইখ তাকে বললেন: আর আপনিও সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, উত্তম গন্তব্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এটা হচ্ছে আল্লাহর দীন, যে ব্যক্তি একে সাহায্য করবে আল্লাহও তাকে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি একে শক্তিশালী করবে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে শক্তিশালী করবেন। আর এর প্রভাব আপনি খুব দ্রুত অচিরেই দেখতে পাবেন। তখন তিনি বললেন: হে শাইখ! অচিরেই আমি আপনার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দীনের উপরে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উপরে বাই‘আত গ্রহণ করব। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, যখন আমরা আপনাকে শক্তিশালী

করব এবং আপনাকে সহযোগিতা করব, আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইসলামের শত্রুদের উপরে বিজয় লাভ করাবেন, তখন আপনি আমাদের এই ভূমি ছেড়ে অন্যত্রে চলে যাবেন। আমাদেরকে রেখে আপনি অন্য স্থানে প্রস্থান করবেন। তখন তিনি বললেন: না; আমি আপনার কাছে এ ব্যাপারে অঙ্গীকার করছি। আমি আপনার কাছে এ ব্যাপারে অঙ্গীকার করছি যে, রক্তের প্রয়োজনে রক্ত, ধ্বংসের প্রয়োজনে ধ্বংস, আমি আপনার এই শহর থেকে কখনোই অন্যত্রে যাব না। এরপর তিনি তাঁকে সাহায্য করা এবং এই শহরেই স্থায়ীভাবে থাকার ব্যাপারে বাই'আত নিলেন। আর এটা এ মর্মে যে, তিনি আমিরের নিকটেই অবস্থান করবেন, তিনি তাকে সহযোগিতা করবেন এবং তার সাথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবেন, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তার দীনকে বিজয়ী করেন। এ কথার উপরে বাই'আত সম্পন্ন হল। অতঃপর আল-উআইনাহ, আরাকাহ, মানফূহাহ, রিয়াদ, এবং আশেপাশের অন্যান্য শহরগুলো থেকে দিরইয়্যাহতে দলে দলে লোক আসতে শুরু করল। এছাড়াও তখন দিরইয়্যাহ একটি হিজরতের স্থান হয়ে দাঁড়ালো যেখানে মানুষ বিভিন্ন স্থান থেকে হিজরত করে আসছিল। দিরইয়্যাহ শহরে শাইখের খবর, পাঠদান, আল্লাহর প্রতি আহ্বান ইত্যাদি এক কান হতে অন্য কানে যাচ্ছিল। সুতরাং তারা দলে দলে ও ব্যক্তিগতভাবে শাইখের কাছে আসতেছিল। এতে শাইখ দিরইয়্যাহতে সাহায্যপ্রাপ্ত, সম্মানিত, প্রিয়ভাজন ও শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। তিনি দিরইয়্যাহতে আক্বীদা, কুরআন কারীম, তাফসীর, ফিক্বহ, হাদীস, মুস্তালাহুল হাদীস, আরবী ও ইতিহাসসহ অন্যান্য উপকারী ইলমের পাঠদান চালু করেন।

এরপর তার কাছে প্রতিটি স্থান থেকে দলে দলে লোক আসতে শুরু করল। তার কাছে দিরইয়্যাহতে যুবক ও অন্যান্যরাও শিক্ষা লাভ করতে লাগল। তিনি জনসাধারণ ও বিশেষ শ্রেণির মানুষের জন্য ব্যাপকভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করলেন। দিরইয়্যাহতে তিনি ইলমে দীন ছড়িয়ে দিলেন এবং দাওয়াতের উপরে অটল থাকলেন। এরপরে তিনি জিহাদ শুরু করলেন। মানুষকে এই ময়দানে যোগ দেওয়ার জন্য ও তাদের অঞ্চলে বিদ্যমান শিরকগুলোকে ধ্বংস করার জন্য পত্রযোগে আহ্বান জানালেন। তিনি এটি শুরু করলেন নজদের অধিবাসীদের মাধ্যমে, তিনি নজদের আলিম সমাজ ও নেতৃস্থানীয়দের কাছে পত্র লিখলেন। রিয়াদের আলিমদের নিকটে লিখলেন, তখন সেখানকার আমীর ছিলেন দিহাম ইবনু দাওয়াস। তিনি খারজ শহরের আলিম ও নেতৃবৃন্দের কাছে পত্র লিখলেন। এছাড়াও দক্ষিণ অঞ্চলের শহরসমূহ এবং কসীম, হায়েল, আল-ওয়াশাম, সুদাইরসহ আরো অন্যান্য শহরেও তিনি পত্র প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে চিঠি লেখা অব্যাহত রাখলেন এবং আলিম উলামা ও নেতৃস্থানীয় লোকেরাও তার কাছে পত্র প্রেরণ অব্যাহত রাখলেন। অনুরূপভাবে আহসা এবং হারামাইন শরীফাইনের আলেমগণও। অনুরূপভাবে এর বাইরের আলিমগণ যেমন: মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ভারত, ইয়ামেন এবং অন্যান্য শহরের আলিমগণও। তিনি মানুষকে লিখতে থাকলেন এবং তাদের কাছে হুজ্জাত কায়েম করলেন। তিনি মানুষকে জানালেন যে সমস্ত ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ শিরক এবং বিদ‘আতে লিপ্ত হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, সেখানে কোন দীনের সাহায্যকারী (সত্যপন্থী)

ছিল না; বরং সেখানে অনেক সাহায্যকারী (সত্যপন্থী) ছিলেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা দায়িত্ব নিয়েছেন এই দীনের জন্য যে, সেখানে অবশ্যই তার কোনো না কোনো সাহায্যকারী থাকবেই। আর এই উম্মতের একটি দল সর্বদাই হকের ব্যাপারে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকমই বলেছেন। সুতরাং সেসব স্থানে সত্যের সহযোগিতা করার মত অনেকেই ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু এখন যে বিষয়ে কথা হচ্ছে তা হচ্ছে নজদ সম্পর্কে, সেখানে অকল্যাণ, বিশৃংখলা শিরক ও কুসংস্কার ইত্যাদি এমন ভাবে ছড়িয়ে ছিল, যার হিসাব একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। সেই সাথে সেখানে আলিমগণও ছিলেন যাদের মধ্যে উত্তম দিকগুলো থাকলেও তারা দাওয়াতের ময়দানে সেভাবে সক্রিয়ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হননি যেরকমটি প্রয়োজন ছিল।

আর ইয়ামেন এবং ইয়ামেনের বাইরেও হকের দিকে দাওয়াত প্রদানকারী ও সহযোগী অনেকেই ছিলেন, যারা এই শিরক এবং এই সকল কুসংস্কার সম্পর্কে জানতেন; কিন্তু আল্লাহ তাদের দাওয়াতকে সফলতার রূপ দান করেননি যেমনটি শাইখ মুহাম্মাদকে করেছিলেন। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: তাদের জন্য পর্যাপ্ত সহযোগী ও সাহায্যকারী না থাকা, অধিকাংশ দা'ঈদের সবর ও আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট সহ্য না করা।

এর মধ্যে আরও রয়েছে: কতিপয় দা'ঈর মানুষকে কার্যকরী পন্থা, উপযোগী ভাষ্য, হিকমাত এবং উত্তম নসিহত সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব থাকা। এছাড়াও অন্যান্য কারণও রয়েছে। এই সকল চিঠিপত্র অধিকহারে লেখালেখির জন্য শাইখের কর্মকাণ্ড

প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং দাওয়াতী কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হয়। তার চিঠি-পত্র গুলো জাজিরাতুল আরবের ভেতরে এবং বাইরে আলেমদের নিকট পৌঁছে যায়। তার দাওয়াতের মাধ্যমে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, আফ্রিকা, মরক্কো এবং অনুরূপভাবে মিশর, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি অঞ্চলে বিরাট এক জনসংখ্যা প্রভাবিত হয়। এবং সেখানেও অসংখ্য দা‘ঈ ছিলেন, তাদের কাছে হক এবং হকের দিকে আহ্বানের জ্ঞান ছিল। যখনই তাদের কাছে শাইখের দাওয়াত পৌঁছাল, তখন তাদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেল এবং তাদের শক্তিও বৃদ্ধি হল। সুতরাং তারাও দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। শাইখের দাওয়াত অব্যাহতভাবে প্রসিদ্ধ হতে থাকলো এবং ইসলামী বিশ্ব ছাড়াও অন্যান্য স্থানে তা প্রকাশ পেতে লাগল। এরপরে এই শেষ যুগে এসে তার কিতাবসমূহ এবং ছোট ছোট পুস্তিকাগুলি মুদ্রিত হয়েছে। তার সন্তান-সন্ততি, সহযোগী ও সাহায্যকারী মুসলিম বিদ্বানগণের কিতাবসমূহও মুদ্রিত হয়েছে। জাজিরাতুল আরবে এবং এর বাইরেও তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে লিখিত কিতাবাদি, তার জীবনী, তার সাথীদের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক কিতাবও মুদ্রিত হয়েছে। এমনকি মানুষের কাছে অধিকাংশ অঞ্চল ও প্রান্তরে তা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর এটা জানা কথা যে, প্রতিটি নি‘আমাতের জন্যই হিংসুক রয়েছে এবং প্রতিটি দা‘ঈর জন্যও অসংখ্য শত্রু রয়েছে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন: “আর এভাবেই আমরা মানব ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরকে কুমন্ত্রণা দেয়। যদি আপনার রব ইচ্ছে করতেন তবে তারা এসব করত না; কাজেই আপনি তাদেরকে ও

তাদের মিথ্যা রটনাকে পরিত্যাগ করুন।” [আল-আন‘আম, আয়াত: ১১২] যখন শাইখ তার দাওয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন, অসংখ্য পত্রাদি লিখলেন, গ্রন্থাদি রচনা করলেন, মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দিলেন এবং আলিমদের কাছে পত্রাদি প্রেরণ করলেন, তখন একদল হিংসুক ও তার বিরোধীতাকারীদের আত্মপ্রকাশ ঘটল। এছাড়াও অন্যান্য শত্রুদেরও প্রকাশ ঘটল।

তার শত্রুরা ও বিরোধিতাকারীরা দুই ভাগে বিভক্ত: এদের একটি দল যারা ইলম ও দীনের নাম দিয়ে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছিল। আর অন্য দলটি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছিল রাজনৈতিক দিক থেকে; কিন্তু তারা ইলমের অন্তরালে লুকিয়ে থাকত এবং দীনের নামের আড়ালেও লুকিয়ে থাকত। আর এরা তাদের থেকে সুবিধা নিচ্ছিল, যারা আলিমদের মধ্য হতে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছিল আর বলেছিল যে, তিনি হকের পথে নেই। তিনি এমন... এমন...। কিন্তু শাইখ রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি তার দাওয়াতে অব্যাহত থেকে সন্দেহগুলো অপনোদন করছিলেন, দলীল স্পষ্ট করছিলেন, মানুষকে তিনি পথ দেখাচ্ছিলেন আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ভিত্তিক বাস্তবতার দিকে। তখন তারা বলল: নিশ্চয় সে হচ্ছে খারেজীদের একজন। আবার কখনো বলত: সে ইজমাকে বিনষ্ট করে নিজেকে মুজতাহিদ মুত্বলাক হিসেবে দাবী করছে। তিনি তার পূর্বের আলিম ও ফকীহদের কোনো তোয়াক্কা করছেন না। আবার কখনো তারা অন্যান্য অপবাদও দিত। তাদের একটি দল যারা অল্প ইলমের কারণে এসব অপবাদ দিতো। অন্য আরো একটি দল হচ্ছে যারা

অন্যদের তাকলীদ করত, অন্যদের উপরে ভরসা করত। আরো একটি দল ছিল, যারা ভয় করত তাদের পদ-মর্যাদার, তাদের বিষয়টি ছিল রাজনীতি। তারা ইসলাম ও দীনের নামের আড়ালে লুকিয়ে থাকত আর কুসংস্কারপন্থী ও বিভ্রান্তদের কথার উপরে ভরসা করত।

বিরোধীরা মূলত তিন ধরনের ছিল: একদল কুসংস্কার পন্থী আলেমরা, যারা হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক বলে মনে করত। তারা বিশ্বাস করত কবরের উপরে স্থাপনা নির্মাণ, কবরকে সিজদার স্থান হিসেবে গ্রহণ করা, আল্লাহ ছাড়া উক্ত কবরগুলোকে আহ্বান করা, তার কাছে সহযোগিতা কামনা করা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়গুলো হচ্ছে দীন এবং হিদায়াত। তারা আরও বিশ্বাস করত: যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করে সে মূলতঃ নেককারদেরকে অপছন্দ করে, আউলিয়াদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। আর সে হচ্ছে এমন শত্রু যার সাথে যুদ্ধ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় দল ছিল: যারা ইলমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল; কিন্তু তারা এই ব্যক্তির হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তারা তার সত্যতা সম্পর্কে জানত না যে দিকে তিনি দাওয়াত দিতেন। বরং তারা অন্যদের অন্ধ তাকলীদ করত। কুসংস্কারবাদী ও বিভ্রান্ত লোকেরা তার সম্পর্কে যা বলত, তারা তাই বিশ্বাস করত। তারা ধারণা করেছিল যে, আউলিয়া-আম্বিয়া, এবং তাদের শত্রুতা ও তাদের কারামাতকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তারা যা শাইখের সঙ্গে সম্পৃক্ত (মিথ্যারোপ) করত, সে ব্যাপারে তারা হিদায়াতের উপরে ছিল।

তাই তারা শাইখকে নিন্দা করল, তার দাওয়াতকে তিরষ্কার করল এবং তার থেকে পলায়ন করল।

তৃতীয় আরেকটি দল ছিল: যারা তাদের মান-মর্যাদা ও পদবীর ব্যাপারে ভয় করছিল। সুতরাং তারাও এ কারণে শত্রুতা পোষণ করল যেন ইসলামী দাওয়াতের সহযোগীদের হাত তাদের পর্যন্ত বিস্তৃত না হয় এবং তারা তাদেরকে তাদের মর্যাদা থেকে অপসারণ করে তাদের অঞ্চলসমূহে দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। আর তর্কযুদ্ধ, বিতর্ক ইত্যাদি তার ও তার বিরোধীদের মধ্যে চলতে থাকল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখতে লাগলেন। তারাও তাদের পক্ষ থেকে পত্র লিখতে লাগল। তাদের সাথে বিতর্ক হল, শাইখ তাদের জবাব প্রদান করতে থাকল এবং তারা ও তার জবাব প্রদান করতে থাকল। এভাবে করে দাওয়াতের বিরোধীরা এবং শাইখের সন্তান-সন্ততি ও সহযোগীদের মধ্যেও অনুরূপ চলতে থাকল। এক পর্যায়ে লিখিত পত্র-পত্রিকাগুলো অসংখ্য হয়ে গেল এবং তাদের জবাবও ব্যাপকতর হল। এ সকল পত্র, ফাতওয়াগুলো এবং তার জবাবসমূহ অনেক খন্ডে পরিমাণ হয়ে গেল, যার অধিকাংশই মুদ্রিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। শাইখ তার দাওয়াত এবং জিহাদ অব্যাহত রাখলেন। তাকে দিরইয়্যাহর আমীর সৌদি পরিবারের পূর্বপুরুষ মুহাম্মদ ইবন সা‘ঊদ তাকে সহযোগিতা করলেন এবং জিহাদের পতাকা উত্তোলিত হল। এ জিহাদ শুরু হয়েছিল ১১৫৮ হিজরীতে। জিহাদ শুরু হল তলোয়ার এবং বিতর্কের মাধ্যমে, স্পষ্ট প্রমাণাদি ও দলীল দ্বারা। এরপর তলোয়ারের জিহাদের সাথে সাথে দাওয়াত চলতে থাকল। আর

এটা জানা কথা যে, আল্লাহর রাস্তায় কোনো দা'ঈর যদি এমন শক্তি না থাকে, যা হককে সাহায্য করবে এবং তাকে বাস্তবায়ন করবে, তবে খুব দ্রুতই সে দাওয়াত বিপর্যস্ত হয় এবং তার প্রসিদ্ধি নিভে যায়। এরপর তার সহযোগীদের সংখ্যাও কমে যায়। এটাও জানা কথা যে, বিরোধীদের দমনে, সত্যকে সাহায্যের ক্ষেত্রে এবং বাতিলকে বিলুপ্ত করতে দাওয়াত প্রসারের ক্ষেত্রে অস্ত্রের কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীতে তিনি সত্যই বলেছেন। আর তিনিই তো সুমহান তিনি তার প্রত্যেক কথাতে সত্যবাদী- "অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্টা করে। আমরা আরও নাযিল করেছি লোহা যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যেন চিনে নিতে পারেন যে, কে না প্রত্যক্ষ করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" [আল-হাদীদ, আয়াত: ২৫] সুতরাং আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণ সহকারে প্রেরণ করেছেন। আর তা হচ্ছে হুজ্জাত এবং সুস্পষ্ট দালিলিক প্রমাণ, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হককে স্পষ্ট করেছেন এবং বাতিলকে প্রতিহত করেছেন। তিনি রাসূলদের সাথে কিতাব প্রেরণ করেছেন, যাতে রয়েছে স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত এবং ব্যাখ্যা। তিনি তাদের সাথে মীযান নাযিল করেছেন। সেটি হচ্ছে ন্যায়বিচার যার মাধ্যমে মজলুম ও জালিমের মধ্যে ন্যায় ও নীতি প্রতির্ষ্ঠিত হয়। এর দ্বারা হক প্রতির্ষ্ঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে তিনি হিদায়াত ছড়িয়ে দেন। মানুষের সাথে তার

আলোকে হকের ফয়সালা করেন। আর এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন লোহা, এতে রয়েছে অত্যন্ত শক্তি, রয়েছে ক্ষমতা, হুমকি ও ভয় প্রদর্শন ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য, যারা হকের বিরোধিতা করে। সুতরাং লোহা হচ্ছে তাদের জন্য যার কাছে প্রমাণ কোন কাজে আসে না এবং তার মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলে না। আর এটি হচ্ছে তাদেরকে নিবৃতকারী।

এদের সম্পর্কে কতই না উত্তম কথা, যিনি বলেছেন:

আর তা তো অহী অথবা ধারালো তলোয়ার ছাড়া কিছুই নয় *** যার ধার প্রতিটি কুটিল ব্যক্তির ঘাড়ের সূক্ষ্ণ রগ দুটি ছিন্ন করে।

এটি (তলোয়ার) প্রতিটি জাহিলের রোগের ঔষধ *** আর এটি (অহী) প্রতিটি ন্যায়বান ব্যক্তির রোগের ঔষধ।

সুতরাং সুস্থ স্বভাবের অধিকারী বিবেকবান মানুষ দলিল দ্বারা উপকৃত হয় এবং দলিলের মাধ্যমে সে সত্যকে গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির অনুসারী জালিম ব্যক্তিকে তলোয়ার ছাড়া অন্য কিছুই ভীত করতে পারে না। তাই শাইখ রহমতুল্লাহি আলাইহি দাওয়াত এবং জিহাদ দুটির ক্ষেত্রেই প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং আলে সা'ঊদ বা সা'ঊদ পরিবারের সহযোগীরাও তাকে সাহায্য করেছিলেন- আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তিনি জিহাদ এবং দাওয়াতে ১১৫৮ হিজরী সাল থেকে অব্যাহত রাখলেন, যতদিন না আল্লাহ তার ওফাত দান করেন ১২০৬ হিজরীতে। সুতরাং জিহাদ এবং দাওয়াত প্রায় ৫০ বছরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। জিহাদ, দাওয়াত, সংগ্রাম, হকের ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এবং

আল্লাহ ও তার রাসুল যা বলেছেন তার ব্যাখ্যা প্রদান, আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহ্বান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শরীয়ত প্রণয়ন করেছেন, তাতে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি চলতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আনুগত্য মেনে নিল, আল্লাহর দীনে প্রবেশ করল, তাদের কাছে যে সকল গম্বুজগুলো ছিল সেগুলো ধ্বংস করল এবং তারা কবরের উপর নির্মিত তাদের মসজিদগুলোও ধ্বংস করল। তারা শরী‘আতকেই ফয়সালাকারী বানিয়ে নিল এবং তার আনুগত্য করল, তাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষেরা যার উপরে ছিল, সেগুলো এবং তাদের নিয়ম-কানুনকেও ত্যাগ করল এবং তারা হকের দিকে ফিরে আসল, মসজিদসমূহ সালাত ও ইলমী হালাকাহর মাধ্যমে আবাদ করল, যাকাত আদায় করা হল এবং মানুষ রমযানে সিয়াম পালন করল, যেমনি আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলা শরী‘আত প্রণয়ন করেছেন। সৎ কাজের আদেশ করা হল, অসৎ কাজে নিষেধ করা হল, রাস্তাঘাট, গ্রামগঞ্জ, শহরে ও বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা অর্জিত হল। মরুবাসীরা তাদের সীমার মধ্যে থেমে গেল, আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করল এবং হক গ্রহণ করল। শাইখ তাদের মধ্যে দাওয়াতের প্রসার ঘটান, শাইখ তাদের কাছে সত্যের পথ নির্দেশক ব্যক্তিদেরকে প্রেরণ করেছিলেন, দা‘ঈদেরকেও বিভিন্ন মরুবাসী ও বেদুঈনদের নিকটে পাঠালেন, যেমনিভাবে তিনি পথপ্রদর্শক, শিক্ষক ও কাযীদেরকে পাঠাতেন বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে-গঞ্জে। এই মহৎ কল্যাণ এবং হেদায়াত নজদের প্রতিটি স্থানেই ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল এবং সেখানে সত্য ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ তা‘আলার দীন সেখানে প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর শাইখ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর পর তার সন্তানেরা, পৌত্রগণ, সহযোগীবৃন্দ এবং ছাত্ররা আল্লাহর পথে দাওয়াতে এবং জিহাদে নিরবিচ্ছিন্নভাবে লেগে ছিলেন। শাইখের সন্তানদের মধ্য থেকে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন: আল-ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ, শাইখ হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ, শাইখ আলী ইবন মুহাম্মাদ, শাইখ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ। আর তার পৌত্রদের মধ্য থেকে অগ্রগণ্য ছিলেন: শাইখ আব্দুর রহমান ইবন হাসান, শাইখ আলী ইবন হুসাইন, শাইখ সুলাইমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ এবং আরো অনেকে। আর তাঁর ছাত্রদের মধ্যে হতে ছিলেন: শাইখ হামদ ইবন নাসির ইবন মা‘মার, দিরইয়্যাহ শহরের অসংখ্য আলিম ও অন্যান্যরা। তারাও দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং তারা আল্লাহর দীনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা, পুস্তিকা লেখা এবং দীনের শত্রুদের সাথে জিহাদ করার মাধ্যমে। এই সমস্ত দা‘ঈদের মধ্যে এবং তাদের বিরোধীদের মধ্যে কোন শত্রুতার কিছুই ছিল না, শুধুমাত্র এটা ছাড়া যে, তারা আল্লাহর তাওহীদ, আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইখলাছ ও এর উপরে দৃঢ় থাকা, কবরের উপর নির্মিত মসজিদসমূহ ও গম্বুজসমূহকে ধ্বংস করা ইত্যাদির প্রতি আহ্বান করতেন। এছাড়াও তারা সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, শরী‘আত প্রণীত হদ্দসমূহের কায়েম করা ইত্যাদির দিকেও আহ্বান করতেন। আর এগুলোই মূলতঃ মানুষের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে মত-দ্বন্দ্বের কারণ ছিল। সারকথা হচ্ছে: তারা আল্লাহর তাওহীদের দিকে মানুষকে পথ নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, তাদেরকে এ ব্যাপারে আদেশ দিয়েছিলেন, মানুষকে আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং এর অসীলা ও উপকরণ সম্পর্কে

সতর্ক করেছিলেন। মানুষকে ইসলামী শরীয়াত মেনে নেয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছিলেন। আর যে ব্যক্তি স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং দাওয়াত এসে যাওয়ার পরেও এগুলো অস্বীকার করত এবং শিরকের উপরে অবিচল থাকত, তারা তার সাথে আল্লাহর জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। তারা সেসব ব্যক্তিদের অঞ্চলে আগমন করত, যতক্ষণ না সে সত্যকে মেনে নেয় এবং সত্যের অনুগত হয়। অথবা তারা তাকে বাধ্য করতেন শক্তি এবং তলোয়ারের মাধ্যমে, যতক্ষণ না সে এবং তার শহরের লোকেরা উক্ত বিষয় মেনে নেয়। অনুরূপভাবে তারা মানুষকে বিদ‘আত এবং কুসংস্কার থেকে সতর্ক করতেন, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা সুস্পষ্ট প্রমাণ নাযিল করেননি, যেমন: কবরের উপর স্থাপনা নির্মাণ, তার উপর গম্বুজ প্রতিষ্ঠা করা, তাগুতদের কাছে ফয়সালার জন্য যাওয়া, গণক ও জাদুকরদের কাছে ভাগ্য জিজ্ঞাসা করা এবং সেগুলো বিশ্বাস করা ইত্যাদি। অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা শাইখ এবং তার সহযোগীবৃন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহিমের মাধ্যমে এগুলো দূর করে দিয়েছেন।

মসজিদসমূহ কিতাব এবং পবিত্র সুন্নাহ, ইসলামের ইতিহাস ও আরবী ভাষার উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দানের মাধ্যমে আবাদ করা হচ্ছিল। মানুষ ইলমী আলোচনা, ইলম অন্বেষণ, হেদায়াত, দাওয়াত ও পথ নির্দেশনা ইত্যাদির মধ্যে ব্যস্ত ছিল। অন্য আরেক শ্রেণির মানুষ ছিল যারা তাদের দুনিয়াবী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিল, যেমন: চাষাবাদ, শিল্প-কলকারখানা ইত্যাদি কাজে, তারাও ইলম, আমল, দাওয়াত, পথ নির্দেশনা, দীন ও দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হয়েছিল। এ ধরনের লোকেরা ইলম শিখত, আলোচনা করত,

আবার সেই সাথে তারা চাষাবাদে, শিল্প কলকারখানাতে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে, ইত্যাদির কাজেও নিয়োজিত থাকত। তারা কখনো দীনের কাজে মশগুল হতেন, আবার কখনো দুনিয়ার কাজে। এরা আল্লাহর দিকে পথ দেখাতেন এবং দা‘ঈ হিসেবে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন, সেই সাথে তারা তাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের শিল্প কর্মের সাথে জড়িত ছিলেন, যার ফলে তারা তাদের বাইরের দেশসমূহ হতে অমুখাপেক্ষিতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। দা‘ঈগণ এবং সা‘উদ পরিবার নজদের থেকে দাওয়াতী কাজ করার পরে, তাদের দাওয়াত হারামাইন এবং জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন। তারা হারামাইনের আলিমদের কাছে আগে এবং পরে পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু যখন দাওয়াত ফলপ্রসূ হলো না এবং হারামাইনের অধিবাসীরা যার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেমন গম্বুজকে সম্মান করা, কবরের উপর গম্বুজ স্থাপন করা, এবং সেখানে শিরক এর উপস্থিতি এবং কবরের মানুষগুলোর কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি, তখন ইমাম সা‘উদ ইবন আবদুল আজীজ ইবন মুহাম্মাদ শাইখের ওফাতের এগার বছর পরে হিজাযের দিকে রওনা হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে তায়েফের অধিবাসীদের অধীন করেন এবং তারপর তিনি মক্কার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে রওনা হন। আহলে তায়েফের কাছে সা‘উদের পূর্বে সেখানে গিয়েছিলেন আমির উসমান ইবন আব্দুর রহমান অল-মুদ্বাইফী। সে তাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে বশে আনেন, যেই শক্তি দিরইয়্যাহর আমীর সা‘উদ ইবন আবদুল আজীজ ইবন মুহাম্মাদ নজদ ও আশেপাশের এলাকার সৈন্য দিয়ে গঠন করে তার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এক বিরাট শক্তিশালী

বাহিনী। তারা আমীরকে সহযোগিতা করেন, ফলে তিনি শরীফ কর্তৃক নিয়োজিত আমীরদেকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে তায়েফ দখল করে নেন। এবং সেখানে আল্লাহর দিকে দাওয়াতকে প্রতিষ্ঠা করেন, হকের দিকে পথ নির্দেশ করেন, সেখানে যে সমস্ত শিরক বিদ্যমান ছিল এবং ইবন আব্বাসসহ অন্যান্যদের ইবাদাত যা তায়েফের অধিবাসীদের মধ্য হতে সেখানকার মূর্খ ও নির্বোধেরা করত, সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেন। তারপর আমীর সা'উদ তার পিতা আবদুল আজীজ ইবনু মুহাম্মাদের আদেশে হিজায অভিমুখে রওনা হন এবং সৈন্যরা মক্কার চতুর্পাশে জড়ো হয়।

সুতরাং যখন মক্কার প্রধানরা বুঝতে পারল যে আত্মসমর্পণ অথবা পলায়ন ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই তখন জেদ্দার দিকে পলায়ন করল। আর সা'উদ এবং তার সাথে যে সকল মুসলিমরা ছিলেন তারা যুদ্ধ ব্যতিরেকেই সেখানে প্রবেশ করলেন এবং মক্কা দখল করলেন। এটি সংঘটিত হয়েছিল শনিবার ফজরের সময় ৮ মুহাররম ১২১৮ হিজরীতে। এবং তারা সেখানে আল্লাহর দীনের দাওয়াতকে বিজয়ী করেছিলেন, এবং সেখানে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাসহ অন্যান্যদের কবরের উপরে স্থাপিত গম্বুজসমূহকে তারা ধ্বংস করেছিলেন এবং তারা প্রত্যেকটি গম্বুজের মূলোৎপাটন করেছিলেন। তারা সেখানে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের প্রতি দাওয়াতকে বুলন্দ করেছিলেন এবং সেখানে শিক্ষক, পথ-নির্দেশক, আল্লাহর শরীয়তের মাধ্যমে ফয়সালাকারী কাযীদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। এরপর খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে মদীনা বিজয় হয়। সা'উদ পরিবার মক্কা বিজয়ের মাত্র

দু'বছর পরেই ১২২০ হিজরীতে মদীনা দখল করেন। এরপর থেকে হারামাইন সা'উদ পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে ছিল। তারা সেখানে নিয়োগ করেছিলেন পথ নির্দেশক এবং দা'ঈ। তারা দেশে ন্যায়বিচার ও শরীয়তের হুকুম জারী করেছিলেন এবং নাগরিকদের প্রতি ইহসান করেছিলেন বিশেষতঃ তাদের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং অভাবী মানুষেরদেরকে। তারা তাদের প্রতি সম্পদ দিয়ে ইহসান করেছেন। তাদের প্রতি সহমর্মী হয়েছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাদেরকে কল্যাণের পথে নির্দেশনা দিয়েছেন, আলেমদেরকে সম্মান করেছেন এবং তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছিলেন দীনী শিক্ষা ও পথনির্দেশের ক্ষেত্রে। এভাবে করে ১২২৬ হিজরী সাল পর্যন্ত হারামাইন শরীফাইন সা'উদ পরিবারের রক্ষনাবেক্ষনেই ছিল। এরপরে মিশরী ও তুর্কী সৈন্যরা আলে সা'ঊদ বা সা'ঊদ পরিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং তাদেরকে হারামাইন থেকে বের করে দিতে হিজায অভিমূখে আসতে থাকে। এর পিছনে বহু কারণ রয়েছে যেগুলোর মধ্য হতে কতিপয় ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এসব কারণ যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: তাদের শত্রু এবং হিংসুক সম্প্রদায় এবং কুসংস্কারে বিশ্বাসী যাদের কোনো দূরদর্শিতা ছিল না, আরো কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যারা এই দাওয়াতকে বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছিল এবং তারা এটা থেকে ভয় পাচ্ছিল যে এটা তাদের পদ-মর্যাদাকে বিলুপ্ত করে দিবে এবং তাদের আশাগুলো নষ্ট করে দিবে। তাই তারা শাইখের উপরে এবং তার অনুসারী ও সহযোগিদের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করেছিল। তারা বলেছিল: নিশ্চয়ই এরা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে

শত্রুতা পোষণকারী, আউলিয়াদের সাথে শত্রুতা পোষণকারী এবং তাদের কারামত অস্বীকারকারী। তারা আরো বলেছিল: নিশ্চয়ই এরা এমন ... এমন ... কথা বলে থাকে যেমনটি এই সমস্ত লোকেরা ধারণা করে যে, এর মাধ্যমে রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়। আর এটিকে কতিপয় মূর্খ এবং সুবিধাবাদী লোকেরা সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। তারা এটিকে তাদের সুবিধা প্রাপ্তির জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সিঁড়ি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর সে সাথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে ছিল তুর্কি এবং মিশরীয়দের উৎসাহ প্রদান। সুতরাং ফিতনা এবং যুদ্ধের মধ্য থেকে যা হওয়ার তাই হলো। মিশরীয় ও তুর্কি সৈন্যদের সাথে যারা ছিল তাদের ও সা'উদ পরিবারের মধ্যে হিজাযে ও নজদে ১২২৬ হিজরী সাল থেকে ১২৩৩ হিজরী সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এতে কখনো এক পক্ষের বিজয় হত কখনো অন্য পক্ষের, এই সাত বছরের প্রতিটি বছর ছিল যুদ্ধ ও সংগ্রামের হক এবং বাতিলের সৈন্যদের মাঝে।

সারকথা হচ্ছে: ইনিই হচ্ছেন শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওহহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করা, মানুষকে আল্লাহর তাওহীদের দিকে পথ-নির্দেশ করা এবং সে ক্ষেত্রে মানুষ যে সব বিদ'আত এবং কুসংস্কার জাতীয় যা কিছু প্রবেশ করিয়েছিল সেগুলো হতে বাধা প্রদান ইত্যাদির জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি মানুষকে হক মেনে নিতে বাধ্য করা, তাদেরকে বাতিল বিষয় থেকে নিষেধ করা, তাদেরকে সৎ কাজে আদেশ এবং

তাদেরকে অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছিলেন।

এটি হচ্ছে শাইখ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহির দাওয়াতের সারকথা। আর আকীদার ক্ষেত্রে তিনি সালাফে সালিহ এর পথেই ছিলেন। তিনি আল্লাহর উপর ঈমান রাখতেন এবং তার পবিত্র নামসমূহ ও গুণাবলীর ব্যাপারেও, তিনি তাঁর ফেরেশতাদের সম্পর্কে ঈমান রাখতেন, তাঁর রাসূলদের সম্পর্কে, তাঁর কিতাব সম্পর্কে, আখিরাত দিবস সম্পর্কে এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের সম্পর্কেও ইসলামের ইমামগণের মত করেই তিনি ঈমান রাখতেন। আল্লাহর তাওহীদ এর ক্ষেত্রে ও তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে ইখলাসের (একনিষ্ঠতার) ব্যাপারে। আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ এবং গুণাবলীর ব্যাপারেও তিনি ঈমান রাখতেন, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য প্রযোজ্য, তিনি আল্লাহর সিফাতসমূহকে নিষ্ক্রিয় করতেন না এবং মাখলুকের সাথে আল্লাহকে সাদৃশ্যও প্রদান করতেন না। আর পুনরুত্থিত হওয়া, পুরস্কার ও শাস্তি, হিসাব-নিকাশ হওয়া ও জান্নাত-জাহান্নাম, ইত্যাদি অন্যান্য ব্যাপারে ঈমানের ক্ষেত্রে তিনি তা-ই বলতেন যা সালাফেরা বলতেন, যেমন: নিশ্চয় ঈমান হচ্ছে কথা এবং কাজ, যা বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস হয়, তা আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহের কারণে কমে যায় বা হ্রাস হয়। এগুলোই ছিল তার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আকীদা। সুতরাং তিনি সালাফের পথ (মানহাজ) ও আকীদার উপরেই ছিলেন, কথা ও কাজে, তিনি কখনোই তাদের পথ হতে বাইরে যাননি। আর না তার আকীদার ক্ষেত্রে কোনো আলাদা মাযহাব ছিল, না কোনো পথ-পন্থা ছিল।

বরং তিনি সাহাবী ও ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণকারী তাবি'ঈগণ তথা সালাফে সালিহের পথেই ছিলেন। আল্লাহ তাদের সকলের উপরেই রাযী-খুশী হয়েছেন।

তিনি নজদ ও তার আশেপাশের এলাকাগুলোতে এটাই প্রচার করেছিলেন এবং এর দিকেই দাওয়াত দিয়েছিলেন। তারপর তিনি যারা অস্বীকার করেছিল এবং এগুলোকে বিদ্বেষমূলকভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ও লড়াই করেছিলেন, যতক্ষণ না আল্লাহর দীন বিজয়ী হয় এবং সত্যের জয় হয়। অনুরূপভাবে তিনি ছিলেন সেই পথের উপরে, যে পথে মুসলিমরা আল্লাহর পথে দাওয়াত দিয়েছিলেন, বাতিলের বিরোধিতা করেছিলেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেছিলেন। উপরন্তু শাইখ এবং তার সহযোগীরা মানুষকে হকের দিকে ডাকতেন, তাদেরকে এটা মেনে নিতে বাধ্য করতেন, তাদেরকে বাতিল থেকে নিষেধ করতেন এবং তাদেরকে বাতিলের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করতেন। তাদেরকে ওগুলো করতে নিষেধ করতেন, যতক্ষণ না তারা সেটাকে পরিত্যাগ করে। ঠিক অনুরূপভাবে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন বিদ'আত এবং কুসংস্কারকে রুখে দেয়ার ক্ষেত্রে, যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার দাওয়াতের মাধ্যমে সেগুলোকে পরিপূর্ণভাবে দূর করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনটি কারণ, যা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হল, এগুলোই হচ্ছে তার সাথে এবং মানুষের মধ্যে শত্রুতার কারণ। সেগুলি হচ্ছে:

প্রথমতঃ শিরকী কাজে বাঁধা প্রদান করা এবং মানুষকে খালেস তাওহীদের দিকে আহ্বান করা। দ্বিতীয়তঃ কুসংস্কার ও বিদ'আতকে

নিষিদ্ধকরণ, যেমন: কবরের উপরে স্থাপনা নির্মাণ, কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করা ও অনুরূপভাবে জন্ম দিবস পালন করা, যে সমস্ত বিষয়গুলো সুফিদের মধ্য থেকে একটি দল আবিষ্কার করেছিল। তৃতীয়তঃ তিনি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিতেন এবং তাদেরকে সৎ কাজ করতে শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করতেন। সুতরাং যে সৎকাজকে অস্বীকার করত যা আল্লাহ তার উপরে ওয়াজিব করেছিলেন, তাকে তিনি বাধ্য করতেন শক্তি দ্বারা এবং তিরষ্কার করতেন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। এবং তিনি মানুষকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন, তাদেরকে অসৎকাজ হতে বাধা প্রদান করতেন, এবং হদসমূহ কায়েম করতেন, মানুষকে হকের ক্ষেত্রে বাধ্য করতেন, তাদেরকে বাতিল থেকে বাধা প্রদান করতেন এবং এর মাধ্যমেই হকের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, তা ছড়িয়ে পড়েছিল, বাতিল ধ্বংস এবং বিনষ্ট হয়েছিল। আর মানুষ তখন উত্তম পথেই অবস্থান করতে থাকল এবং তারা তখন অবিচল মানহাজের উপর অবস্থান করতে থাকল তাদের বাজারসমূহে, মসজিদসমূহে এবং অন্যান্য সকল অবস্থান ও অবস্থাতেই।

তাদের মধ্যে কোন রকম বিদ‘আত দেখতে পাওয়া যেত না, তাদের দেশে কোনো ধরনের শিরক বিদ্যমান ছিল না এবং তাদের মধ্য থেকে কোনোরূপ অন্যায়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটত না। বরং যে ব্যক্তি তাদের অঞ্চল দেখেছিল, তাদের অবস্থা দেখেছিল এবং যে অবস্থার উপরে তারা ছিল তা প্রত্যক্ষ করেছিল, সে সালাফে সালেহীনের অবস্থার কথা স্মরণ করতে পারত এবং তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যার উপরে ছিল এবং তার সাহাবীদের যুগে এবং ইহসানের সাথে তাদের অনুসারী তাবেয়ীদের

যুগে, তথা তিনটি প্রাধান্য প্রাপ্ত যুগের মধ্যে (তা স্মরণ করতে পারত)। আল্লাহ তাদের উপর রহমত করুন। সুতরাং মানুষেরা তাদের জীবন চরিতের উপরেই ছিল, তাদের মানহাজকে গ্রহণ করেছিল, এটার উপরে ধৈর্য ধারণ করেছিল, তার মধ্যেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল এবং সে পথেই যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু যখন কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয় শেষের দিকে এসে শাইখ মুহাম্মাদ মারা যাওয়ার বেশ কিছু সময় পরে এবং তার অধিকাংশ সন্তান ও সহযোগীদের মৃত্যুর পরে, আল্লাহ তাদেরকে রহমত করুন। কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল, তখন পরীক্ষা নেমে আসে এবং দুর্দশা নেমে আসে তুর্কি মিশরীয়দের মাধ্যমে। আর এ কথার সত্যতা প্রদানকারী আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ কোনো কওমের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের পরিবর্তন ঘটায়।" [আর-রা'দ, আয়াত: ১১] আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তাদের উপরে যে বিপদ এসেছিল তা যেন তাদের গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেন। তাদের মর্যাদা এবং শাহাদত নসিব করেন যারা তাদের মধ্যে নিহত হয়েছিল, আল্লাহ তাদের উপর রহমত করুন এবং সন্তুষ্ট হোন। এবং অব্যাহতভাবে তাদের এ দাওয়াত -আলহামদুলিল্লাহ- প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসারিত আমাদের আজকের এই দিন পর্যন্ত। নিশ্চয় মিশরীয়রা নজদে যে গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল, তারা সেখানে যাদেরকে হত্যা করার হত্যা করেছিল এবং যা ধ্বংস করার তা ধ্বংস করেছিল। তবে তা মাত্র কয়েকটি বছরই স্থায়িত্ব পেয়েছিল। এরপরে পুনরায় দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ছড়িয়ে পড়ে এবং পাঁচ বছর পরেই উক্ত দাওয়াত নিয়ে উত্থান ঘটে ইমাম তুর্কি ইবন আব্দুল্লাহ ইবন

মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির। সুতরাং তিনি দাওয়াত সেখানে এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন এবং আলিমগণ নজদে ছড়িয়ে পড়েন। এবং তিনি সেখান থেকে যে সমস্ত তুর্কি এবং মিশরীয়রা ছিল, তাদেরকে বের করে দেন। তাদেরকে তিনি নজদ, তার আশেপাশের গ্রামগুলো এবং শহরগুলো হতেও বিতাড়িত করেন। আর এরপরে ১২৪০ হিজরী সালে দাওয়াত প্রসারিত হয়।

আদ-দিরইয়্যাহ শহরের ধ্বংস ও আলে সা'উদ বা সা'উদ পরিবারের রাজত্ব বিনষ্ট হয়ে পড়ে ১২৩৩ হিজরীতে। সুতরাং তখন মানুষ নজদে এক বিশৃংখলা, ফিতনা ও লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে যায়। যার ব্যাপ্তি ১২৩৪ হিজরী থেকে ১২৩৯ হিজরী পাঁচ বছর পর্যন্ত ছিল। এরপরে ১২৪০ হিজরীতে মুসলিমদের একটি দল নজদে জমা হয় ইমাম তুর্কি ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ এর নেতৃত্বে। সেখানে হক প্রতিষ্ঠিত হয়, আলেমগণ বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের উদ্দেশ্যে নানা চিঠিপত্র লেখেন এবং তারা মানুষকে উৎসাহী করে তোলেন। আর তাদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানান। তখন ফিতনা নির্বাপিত হয়, যা তাদের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে এসেছিল, যার পিছনে ছিল মিশরীয় সেনাবাহিনী এবং তাদের সহচরদের হাত। এভাবেই যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ফিতনা নিঃশেষ হয়ে যায়, যা ঐ যুদ্ধসমূহের পিছু নিয়ে এসেছিল এবং তার অগ্নি নির্বাপিত হয়। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষ এরপরে পুনরায় তা'লিম, পথনির্দেশনা, দাওয়াত এবং আল্লাহমুখী করণের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি পানি তার আপন প্রবাহে ফিরে

আসে, মানুষও তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে, যে অবস্থায় তারা শাইখের জামানায়, তার ছাত্রবৃন্দ, সন্তান-সন্ততি এবং তার সহযোগীদের জামানায় ছিল। আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন এবং রহমত বর্ষণ করুন! এই দাওয়াত অব্যাহত রয়েছে ১২৪০ হিজরী সাল থেকে নিয়ে আমাদের আজকের দিন পর্যন্ত, আলহামদুলিল্লাহ। সা'উদ পরিবার, শাইখের পরিবার এবং নজদের আলিমগণও একে অপরকে প্রতিনিধিরূপে রেখে যাচ্ছেন। অদ্যাবধি সা'উদ পরিবার একে অপরকে রাজত্ব, আল্লাহর দিকে দাওয়াত এবং আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে চলেছেন।

এভাবে আলিমগণও তাদের একে অপরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত এবং তার দিকে পথনির্দেশের ক্ষেত্রে, মানুষকে হকমুখী করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যাচ্ছেন। তবে হারামাইন শরীফাইন সৌদি রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বেশ কিছুদিন বিচ্ছিন্ন ছিল। এর পরবর্তীতে এ দু'টি ১৩৪৩ হিজরীতে তাদের নেতৃত্বে আসে এবং ইমাম আবদুল আজিজ ইবন আব্দুর রহমান ইবন ফয়সাল ইবন তুর্কি ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হারামাইন স্বীয় দখলে নিয়ে নেন। আলহামদুলিল্লাহ! এরপর থেকে আজ পর্যন্ত এ দুটি স্থান এই রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন রয়েছে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা মহা প্রতাপশালী ও সম্মানিত আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি সা'উদ পরিবার, শাইখের পরিবার এবং মুসলিমদের আলিমদের মধ্য থেকে যারা এখনো পৃথিবীতে -হোক এ দেশে অথবা বাইরের দেশে-

জীবিত রয়েছেন, তাদের বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করুন! আর তাদেরকে তৌফিক দান করুন যে কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তার জন্য। এবং তিনি যেন মুসলিম আলিমগণনকে সংশোধন করেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। প্রত্যেককে যেন তিনি হকের ব্যাপারে সাহায্য করেন। তাদের মাধ্যমে বাতিল যেন পরাভূত হয়। আর আল্লাহ তা'আলা আরও তৌফিক দান করুন হেদায়াতের পথে আহ্বানকারীদের, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাদের উপরে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালনের ক্ষেত্রে। আমাদেরকে এবং তাদেরকেও তিনি সিরাতুম মুস্তাকীমের পথ প্রদর্শন করুন! হারামাইন শরীফাইন, তার সংশ্লিষ্ট স্থানগুলো এবং মুসলিমদের সকল অঞ্চলসমূহ হেদায়াত, দীন, আল্লাহর কিতাব ও নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সুন্নাহর প্রতি সম্মান করার দ্বারা আবাদ করে দিন। আর তিনি যেন সকলকে এদুটি বিষয়ের গভীর জ্ঞান, আঁকড়ে ধরার তৌফিক, এদের উপরে ধৈর্য ধারন, এর উপরে টিকে থাকা, এর কাছে ফয়সালা চাওয়ার সেই নি'আমত দান করেন, যতদিন না আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং উত্তর প্রদানে যথার্থ উপযোগী। শাইখের পরিচয়, তার অবস্থা, তার দাওয়াত, তার সহযোগীবৃন্দ ও তার শত্রুদের সম্পর্কে যা বর্ণনা করা সম্ভব হল, তা এ পর্যন্তই। আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করি। তাঁর উপরেই নির্ভরতা, আর সুউচ্চ সুমহান আল্লাহর তৌফিক এবং শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি বা উপায় নেই। আর সকল রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী এবং আমাদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবন

আব্দুল্লাহর উপর, তার পরিবারের উপর, তার সাহাবীদের উপর, যারা তার পথে চলেছেন এবং তার হেদায়াত দ্বারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের উপর। আর বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।